ঢাকা কী ডুবে যাবে

রিপোর্ট **জয়ন্ত আচার্য**

ঢাকা শহর রক্ষা বাঁধের দুই পাশের নিম্নাঞ্চল অপরিকল্পিতভাবে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। গাবতলী থেকে সদরঘাট পর্যন্ত বাঁধের দুই পাশের বিস্তীর্ণ বিলাঞ্চল ভরাট করার প্রতিযোগিতা চলছে। গড়ে উঠছে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির আবাসন প্রকল্প, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা। এমনকি বাঁধের ওপর গড়ে উঠছে বসত বাড়ি। অথচ ঢাকা উন্নয়ন মহাপরিকল্পনায় গাবতলী সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলকে রিজার্ভ ওয়াটার জোন হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিলাঞ্চলকে কৃষি জমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ সাভারের কর্ণপাড়া নদী, তুরাগ, বুড়িগঙ্গার পানি প্রবাহ বিস্তীর্ণ এলাকায় এসে জমাট হতে পারে। বন্যার সময় নদীগুলো অতিরিক্ত পানি প্রবাহ ধারণ করতে পারে। অথচ নিম্নাঞ্চল ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে পানি প্রবাহের চাপ এসে পড়ছে শহর রক্ষা বাঁধের ওপর। বন্যা বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বড় ধরনের বন্যা হলে বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। হঠাৎ করে তলিয়ে যেতে পারে শ্যামলী, আদাবর, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া, পশ্চিম ধানমন্ডি, রায়ের বাজার এলাকা।

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের অভিমত, দেশে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে আগামীতে বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টি বাড়বে। বন্যা হলে পানির স্তর অতীতের চেয়ে বেশি হবে। একারণে বড় বন্যা ৮৮, ৯৮কে হার মানতে পারে। এমন বন্যা হলে হঠাৎই বাঁধ ভেঙ্গে ডুবে যেতে পারে ঢাকা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের আমিন বাজার এলাকা সংলগ্ন জায়গা অধিগ্রহণ করে রিজার্ভ পয়েন্ট নির্মাণের জন্য প্রকল্প রয়েছে। জানা গেছে, অর্থাভাবে কাজ শুরু করতে পারছে না। কৃষি জমির আকার পরিবর্তন করতে হলে অনুমোদন নিতে হয় জেলা প্রশাসকের। অথচ বিলাঞ্চলের কৃষি জমি আবাসন এলাকা হয়ে উঠলেও কর্তৃপক্ষ নীরব। রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো এসব জায়গা বরাদ্দ দিয়ে চলছে। রাজউক বলছে, অনুমোদন ছাড়াই প্রতিষ্ঠানগুলো ভরাটের কাজটি করছে। মূলত তিনটি সংস্থার অবহেলার কারণে ঢাকা শহর রক্ষা বাঁধ আজ হুমকির মুখে। বাঁধ উন্নয়নের মহাপরিকল্পনাও বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ নেই।

সরেজমিনে শহর রক্ষা বাঁধ

বুড়িগঙ্গা নদীর কোল ঘেঁষে ষোড়শ শতাব্দীতে রাজধানী শহর হিসেবে ঢাকা গড়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকা পৃথিবীর অন্যতম শহর হিসেবে খ্যাতি পায়। মূলত ঢাকাকে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা বালু ও তুরাগ নদী সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে। বন্যার সময় পানি প্রবাহ থেকে শহরকে রক্ষার জন্য মোঘল শাসকদের আমল থেকে চেষ্টা শুরু হয়। মোঘল আমলেই শুরু হয় বন্যার সময় ঢাকাকে রক্ষার চেষ্টা । ১৮৬৪ সালে ঢাকার কমিশনার নিযুক্ত হন সি.টি. বাকল্যান্ড। মুনতাসীর মামুন তার স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী গ্রন্থে লিখেছেন, বুড়িগঙ্গার পানি শহরে প্রবাহ প্রবেশ না করা ও ঢাকাবাসীদের বিনোদনের জন্য কমিশনার বাকল্যান্ড বাঁধের ওপর রাস্তা

নির্মাণ করেন। ফলে বাকল্যান্ড বাঁধ হয়ে ওঠে ঢাকাবাসীর বিনোদনের অন্যতম কেন্দ্র। এ কারণে ঢাকাবাসীর পক্ষ থেকে কমিশনার বাকল্যান্ডকে অভিনন্দনপত্র দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। বাঁধের ওপর নির্মিত রাস্তাটি দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয় পৌরসভাকে। ১৯৬৩ সালে এ বাঁধের কর্তৃত্ব চলে যায় পানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের হাতে। ব্রিটিশ নগর পরিকল্পনাবিদ প্যাট্রিক গেঞ্জেস ১৯১৭ সালে ঢাকা নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ পরিকল্পনায় তিনি শহর রক্ষা বাঁধের প্রতি গুরুত্ব দেন। বাকল্যান্ড বাঁধ ছিল তৎকালীন ঢাকার গেন্ডারিয়া এলাকা থেকে বাদামতলী পর্যন্ত বিস্তৃত। '৮৮ সালে বন্যার পর এরশাদ সরকার পুরো ঢাকাকে বন্যামুক্ত করার পরিকল্পনা করে। তিনটি পর্যায়ে বাঁধ দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পশ্চিম দিকে বাঁধের কাজ শেষে হলেও আজও পূর্ব দিকের কাজ হয়নি। অথচ গত দুই যুগ ধরে পশ্চিমের শহর রাস্তা বাঁধটি দুই পাশ দখল হয়ে চলছে।

বাঁধের ওপারেও চলছে প্লট বরাদ্দ

গাবতলীর আমিন বাজারের ডান পাশ দিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীর কোল ঘেঁষে শহর রক্ষা বাঁধ। আওয়ামী লীগ সরকার এই বাঁধের ওপর দিয়ে গাবতলী, সদরঘাট লিংক রোড তৈরি করেছে। এ রোড ধরে সামনে যেতেই চোখে পড়বে মিরপুর, মোহাম্মদপুর এলাকার বিল অঞ্চল। চলছে দখলের প্রতিযোগিতা। শুধু বেড়িবাঁধের ভেতরেই নয়, নদী সংলগ্ন এলাকায়ও চলছে ভরাট। নদী সংলগ্ন এলাকায় বাঁশ দিয়ে, বেড়া দিয়ে ভরাট করছে এম এ জামান কর্পোরেশন। জানা গেছে, কর্পোরেশন নদী ভরাট করে পাথর ভাঙার মেশিন বসাবে। বেড়িবাঁধের ভেতর একটু সামনে যেতেই পূর্বাশা কাঁচা ও পাকা মাল

আড়তদার ব্যবসায়ী বহুমুখী সমিতি দোকান বরাদ্দ দিচ্ছে। গড়ে উঠেছে আজমীরনগর পাক দরবার শরীফ। সৈয়দ জাকির হোসেন চিশতীর মাজার শরীফ। বাঁধের বাইরে নদী সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির মেইনল্যান্ড সিটি জমি বরাদ্দ দিচ্ছে। গড়ে উঠেছে আজিম টাওয়ার নামে পাঁচতলার বিশাল বিল্ডিং। সেখানে গার্মেন্টস কারখানা করা হয়েছে। হাজী দিন মোহাম্মদ ঢাকা উদ্যান বহুমুখী সমবায় সমিতির নামে প্লট বরাদ্দ দিচ্ছে। প্লটের জন্য ইট দিয়ে জায়গা ভাগও করা হয়েছে। এখানে ইসলামী ঐক্য জোটের আল্লামা আজিজুল হক জামিয়া ইসলামী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য জমি বরাদ্দ নিয়েছে। শ্যামলী হাউজিং শেখেরটেক এলাকায় বাঁধের মধ্যে প্লট বরাদ্দ করেই চলছে। অথচ রামচন্দ্রপুর মৌজার এ জমি রাজউকের মাস্টার প্ল্যানে কৃষি জমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হৈমতী সমবায় সমিতি এখানে দিচ্ছে প্লট বরাদ্দ। বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে বায়তুল সালাম জামে মসজিদ। মূলত হাউজিং কোম্পানি, প্রভাবশালী লোকেরা সমিতি, মাদ্রাসার নামে জমি দখল করে নিচ্ছে। এলাকার বাসিন্দা হাফিজ উদ্দীন ২০০০ কে বলেন, 'গত পনেরো বছর আগেও এখানে কোনো বিল্ডিং ছিল না। বর্ষার সময় তুরাগ ও বুড়িগঙ্গার পানি এসে ভরে যেত। আমরা মাছ ধরতাম। শীত এলে নানা সবজি লাগানো হতো। মূলত রাস্তা হওয়ার পর জমি দখলের মাত্রা বেড়ে গেছে। রামচন্দ্রপুর মৌজার আসল জমির মালিকদের বিতাড়িত করা হয়েছে।' মিরপুর এলাকার শহর রক্ষা বাঁধের সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলের দখলের চিত্র একই।

হাজী দিন মোহাম্মদ ঢাকা উদ্যান বহুমুখী সমবায় সমিতির নামে প্লট বরাদ্দ দিচ্ছে। প্লটের জন্য ইট দিয়ে জায়গা ভাগও করা হয়েছে। এখানে ইসলামী ঐক্য জোটের আল্লামা আজিজুল হক জামিয়া ইসলামী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য জমি বরাদ্দ নিয়েছে

সিটি কর্পোরেশন গাবতলী সংলগ্ন বাঁধ এলাকায় আউটফল বানিয়েছে। কর্পোরেশন ময়লা ফেলে নিম্নাঞ্চল ভরাট করছে। তাদের ভরাট করা অঞ্চল দখল করে নিচ্ছে প্রভাবশালীরা। অনুসন্ধানে দেখা গেছে মূলত গাবতলী, মিরপুর, মোহাম্মদপুর অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতা, প্রভাবশালী সন্ত্রাসীদের ব্যানারেই দখল প্রক্রিয়া চলে।

গাবতলী ব্রিজের ওপর গিয়ে তুরাগ, বুড়িগঙ্গার মিলিত ধারার দিকে তাকালে মনে হবে পুরো নিম্নাঞ্চল দখলে চলে গেছে। চলছে ভরাটের প্রতিযোগিতা। বর্ষার পানি এসে ভরাট জমির পাশে জমা হয়েছে। বেড়িবাঁধের ওপর পানি প্রবাহের চাপ আসছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধসংলগ্ন বুড়িগঙ্গা, তুরাগ নদীর এলাকা অধিগ্রহণ করে জলাধার নির্মাণ করার প্রকল্প রয়েছে। তারা জমি অধিগ্রহণ করেছে। তবে তারা অর্থের অভাবের কারণে প্রকল্প এলাকার কাজ শুরু করতে পারছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা ২০০০কে বলেন, 'অর্থ ছাড়া তো প্রকল্পের কাজ শুরু করা যাবে না। অর্থের যোগান হলেই কাজ শুরু হবে।' জমি ভরাট হয়ে গেলে কাজ কিভাবে সম্ভব হবে? এ প্রশ্নের জবাব তিনি দেননি। রাজউক সূত্র জানিয়েছে, বেড়িবাঁধ এলাকায় জায়গা দখল করে যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্থাপনা তুলছে, রাজউক থেকে তারা অনুমোদন নেয়নি। এ প্রসঙ্গে রাজউকের নগর পরিকল্পনাবিদ গোলাম হাফিজ ২০০০কে বলেন, 'আমাদের অনুমোদন না নিয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করলেও বাধা দেয়া সম্ভব হয় না। ভূমি তো আর রাজউকের নয়। আসলে এখন দরকার ভূমি মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও রাজউকের মধ্যে সমন্বয়।'

ঢাকা মহানগরী: হঠাৎই ডুবে যেতে পারে

ঢাকা মহানগরী উন্নয়নে প্রণীত মহাপরিকল্পনায় আমিন বাজার সংলগ্ন এলাকাকে পানি সংরক্ষণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ফ্লাড ফ্লো এলাকা। জলাধার আইনে ফ্লাড জোনের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আইন রয়েছে। আওয়ামী লীগ শাসনামলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা '৯৯ সালে জলাধার ভরাট না করার নির্বাহী আদেশ দেন। পরবর্তীকালে ৩৬/২০০০ নম্বর জলাধার সংরক্ষণ আইন পাস হয়। এই আইনের ২-এর ধারায় বলা হয়েছে, প্রকৃতির জলাধার অর্থাৎ নদী, খাল-বিল, দীঘি, ঝরনা, জলাশয় হিসেবে মাস্টারপ্ল্যানে চিহ্নিত বা সরকার, স্থানীয় সরকার বা কোনো সংস্থা কর্তৃক সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বা বন্যা প্রবাহ এলাকা হিসেবে ঘোষিত কোনো জায়গা এবং সলল পানি বা বৃষ্টির পানি ধারণ করে

এমন জায়গা অন্তর্ভুক্ত হবে। আইনের ৫ নং ধারায় বলা হয় খেলার মাঠ, উন্মুক্ত জায়গা, উদ্যান, প্রকৃতির জলাধারের শ্রেণী পরিবর্তন করা যাবে না। অনুরূপ ব্যবহারের জন্য ভাড়া ইজারা বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করা যাবে না। আইনের ৮ নং ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে ৫ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হবে। বাস্তবে আইনটির কোনো প্রয়োগ নেই। জলাধার আইন প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি বেলা'র অ্যাডভোকেট ইকবাল কবীর লিটন বলেন, 'আইন অনুযায়ী ফ্লাড ফ্লো জোন ও জলাধারে জমি কাঠামো পরিবর্তন নিষিদ্ধ। অথচ আইনটি কার্যকর হচ্ছে না।' বন্যা বিশেষজ্ঞ এএনএইচ আকতার হোসেন ২০০০কে বলেন, 'দেশে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা বলছে আগামী বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টি বেশি হবে। একারণে বন্যা হলে তার পানি প্রবাহের স্তর অতীতের চেয়ে বেশি হবে। দেশে তো স্বাভাবিকভাবে ৮/১০ বছর পর বড় মাত্রার একটি বন্যা হয়। ৮৮/৯৮ সালে বন্যা হয়েছে। আগামীতে বন্যার পানি প্রবাহ আরো বেশি হতে পারে। শহর রক্ষা বাঁধ যেভাবে অরক্ষিত, জলাভূমিও দখল হচ্ছে, তাই বড় মাত্রার বন্যা হলে হঠাৎ ঢাকার বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে যেতে পারে। একারণে শহর রক্ষা বাঁধের সংরক্ষণ প্রয়োজন। প্রয়োজন মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন।'

নগর পরিকল্পনাবিদ জাকির হোসেন ২০০০কে বলেন, 'ঢাকাকে জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষার জন্য অবশ্যই বেড়িবাঁধ এলাকার জলাধার রক্ষা করতে হবে। তা না হলে পরিবেশ বিপর্যয় হতে পারে।' তবে তিনি বলেন, বাঁধটিকে যেভাবে করা হয়েছে তা বন্যায় ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে বাঁধের ওপর বাড়িঘর নির্মাণ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বাঁধের খুব ক্ষতি হতে পারে। বাঁধ রক্ষার জন্য অবশ্যই পানি উন্নয়ন বোর্ডের মনিটরিং এ আরো গুরুত্ব দিতে হবে। জলাধার ভরাট প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা'র সেক্রেটারি আবু নাসের খান ২০০০কে বলেন, 'আমরা ঢাকা শহরের জলাধার রক্ষার জন্য আন্দোলন করেছি। ঢাকাকে বাঁচাতে হলে বেড়িবাঁধ এলাকার জলাধার ও নিম্নাঞ্চল রক্ষা করতে হবে।'

যমুনা গ্রুপ গত বছর আশুলিয়া ভরাট শুরু করলে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সরকার তখন আবাসন উন্নয়ন ও নিম্নাঞ্চল সংরক্ষণের জন্য একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। এই আইন আজও চূড়ান্ত রূপ নেয়নি। দেশের বন্যা পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। বন্যা বিশেষজ্ঞরা আগামী আগস্ট মাসে দেশে ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঢাকা শহর রক্ষার জন্য এখনই সতর্ক হতে হবে।

১ কোটি লোক অধ্যুষিত রাজধানীকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে ঢাকা রক্ষা বাঁধকে নিরাপদ রাখতে হবে। রক্ষা করতে হবে প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্য। তা না হলে হঠাৎ বিপর্যয় ঘটতে পারে।

ছবি : **খালেদ সরকার**

শহর রক্ষা বাঁধ মহাপরিকল্পনায় যা রয়েছে

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই ঢাকা শহর রক্ষা বাঁধের পরিকল্পনা শুরু হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড ৭৫/৭৬ সালে জমি অধিগ্রহণ করে। পরে বাঁধ দেয়ার প্রক্রিয়া থেমে যায়। '৮৮ সালে ভয়াবহ বন্যার পর এরশাদ সরকার ঢাকার চারদিকে বাঁধ দেয়ার দ্রুত প্রকল্প গ্রহণ করে। গ্রহণ করা হয় মহাপরিকল্পনা। এই মহাপরিকল্পনায় তিনটি পর্যায়ে বাঁধের কাজ শেষ করার প্রস্তাব করা হয়। বাকল্যান্ড বাঁধ থেকে গাবতলী। গাবতলী থেকে টঙ্গী। টঙ্গী থেকে ডিএনডি পর্যন্ত। তিনটি পর্যায় বাঁধের কাজ শেষ হলে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ নদীর বর্ষাকালীন প্রবাহ শহরে প্রবেশ বন্ধ হবে। মহাপরিকল্পনায় বলা হয়েছে, বাঁধের কাজ শেষ হবার পর, বাঁধের উপর রেল লাইন তৈরি করা হবে। ত্রিভুজ আকৃতির রেল লাইন দ্বারা রাজধানীর অভ্যান্তরীণ যাত্রী চলাচল করবে। বাঁধের দুই পাশে দুই স্তরের রাস্তা থাকবে। একটি রাস্তা দিয়ে অভ্যন্তরীণ বাস চলাচল করবে। অপরটি দিয়ে আন্তঃজেলা বাস চলবে। মহাপরিকল্পনায় উল্লেখ রয়েছে, বাঁধ এলাকায় থাকবে ৬টি পাম্প। বাঁধের ভেতরের পানি পাম্প করে বের করে দেয়ার জন্য। পরিকল্পনা অনুযায়ী রাখা হয়েছিল সুনির্দিষ্ট জলাধর। কৃষি জমি। বাঁধ অভ্যন্তরের ভূমি উন্নয়ন পরিকল্পনা। অথচ গত ১৬ বছর পর ধরে বাঁধ উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার ন্যূনতম বাস্তবায়ন হয়নি। শেষ হয়নি পূর্বাঞ্চলের বাঁধের কাজ।